Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 70 - 76
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, published on April 2024, Page No. 70 - 76
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

হাসান আজিজুল হকের ছোটগল্প : বিপন্ন-জীবন সংকটের রূপায়ণ

মোবারক হোসেন
গবেষক, বাংলা বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: mobarak0963@gmail.com

Received Date *16. 03. 2024*
Selection Date *10. 04. 2024*

Keyword
Partition, Life crisis, Decadence, Refugee, Realization of society, Trauma.

Abstract
One of the most eminent Writer in Bengali literature is Hassan Azizul Haque. He was born in 1939 at Jabagram in Burdwan district on the time of 2nd world war. Bengal partition was happened in 1947. After 7 Year's, in 1954, Azizul went to Bangladesh (erstwhile East Pakistan) for studying. He as well as his family had to gone to East Pakistan permanently as a result of partition. They were treated as refugees at that time. In his whole life, the trauma of partition and uprootedness came again and again in his memory as well as literature. Haque, in his short story, implemented various types of life's crisis. His three important stories are 'Sakun' (vulture), 'Atmaja o ekti karabi gach' (Daughter and an oleander flower), 'Uttar Basante' (In post Autumn) where he describes crisis of the life from different angel.

'Sakun' is a symbolic story. By using this symbol, writer shows us the relation between exployter and exployted and the decadence form of the society. 'Atmaja o ekti karabi gach' is a diasporic story. A mass of ordinary people who were deprived by the partition, among them there were an old father who used her beloved daughter for some rupees. 'Uttar Basante' is an almost theme like 'Atmaja'. Lipi and Kabir loved each other but partition divided them. Kabir went to East Pakistan where Lipi became a mental patient and then she died. After her demise, Hassan shows us, how her whole family survived in a critical situation. In this essay I am going to show Hassan's literary work analytically and meticulously.

Discussion

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তিন দশক পরেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আবারও সমাজ জীবনে বিভীষিকা রূপ নিয়ে আসে যা অত্যন্ত মর্মন্তুদ বিষয়। বাংলা সাহিত্যমহলে দুই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব যে কতটা সাধারণ মানুষকে দিগভ্রান্ত করেছিল তার প্রভাব সাহিত্য জগতে আলোড়ন তোলে। ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হকের জন্ম এবং ১৯৩৯ সালের

সেই দিনেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পৃথিবী ব্যাপী মানুষদেরকে এক ভয়ংকর সংকটের মধ্যে নিয়ে যায়। ভারতবর্ষ অবিরত পরাধীন শৃঙ্খলের আবদ্ধতায় ব্রিটিশ রাজত্বের শিকারে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করে কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ যে স্বাধীনতার আশা করেছিল মনে প্রানে, সে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষিত সাধ তাদের কাছে অধরায় পরিণত হয়। উক্ত স্বাধীনতা তাদের মনে হতাশা - অবসাদ ও বিপন্নতা নিয়ে আসে। ১৯৪৭ সালে দ্বিখন্ডিত ভারতবর্ষ রূপান্তরের ফলে দেশভাগ, দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু বিভিন্ন সমস্যায় সমাজের অবক্ষয়ের রূপ মানুষের জীবনে এক বিপন্ন বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত বলা যায়। বাস্তব রূপকার হাসান আজিজুল হকের জন্ম চল্লিশের দশকে। সে সময় থেকেই ভারতবর্ষের বুকে বিভিন্ন সংকটের চিত্র মুহুর্মুহু ঘটে যায়। প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া চিত্রের অন্যতম দর্শক হলেন হাসান আজিজুল হক। হাসান আজিজুল হকের জন্ম যেহেতু ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম বাংলায় এবং ১৯৫৪ সালে পড়াশোনার জন্য পূর্ব বাংলায় পাড়ি দেন। দেশভাগের ফলে তাঁকে পূর্ব বাংলায় থেকে যেতে হয় সুতরাং আমরা বলতে পারি দেশভাগের ফলে তাঁকে এবং তার পরিবারকেও নিজের দেশ ছাড়তে হয়েছে। দেশ বিভাগের যন্ত্রণাময় রূপ ও বিপন্ন-জীবনের সংকট চিত্রায়ণ সাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক তাঁর সৃষ্ট ‘শকুন’, ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ এবং ‘উত্তরবসন্তে’ ইত্যাদি গল্পে তুলে ধরেছেন। আমরা আলোচনা পরিধির সীমায় উক্ত গল্পগুলির দিকে নজর দেব।

হাসান আজিজুল হক রচিত ‘**শকুন**’ একটি অন্যতম গল্প। গল্পের আখ্যানজুড়ে রয়েছে মুমূর্ষু পলায়নরত শকুন। কতগুলি ছেলের দল শকুনের পিছু নিয়েছে। তারা শকুনকে দেখে মজার ছলে শকুনের পিছু পিছু ধাওয়া করেছে। ছেলের দলের কথোপকথনে শকুন রূপি সমাজের সুদখোর মহাজন ও মোল্লা-মোড়লের প্রসঙ্গ গল্পে উল্লিখিত।সন্ধ্যাবেলা থেকে দুপুর-রাত পর্যন্ত শকুনের পিছু নিয়ে তারা মানুষ মারীর মাঠে এসে পৌঁছেছে এবং রাত দুপুরে ছেলের দল তালগাছের ওপাশের ন্যাড়া বেলগাছে যে তোরণটি আছে তারই আবছা ছায়ায় শাদামত কি দেখতে পায়। তাদের ভয়াতুর মন নিয়েই মর্মাহত শকুনকে ছেড়ে ছেলের দল বাড়ি ফিরে আসে। পরের দিন গল্পের শেষে দেখা যায় ছেলের দল সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনতে পায় ন্যাড়া বেলতলা থেকে দূরে শকুনটা মরে পড়ে আছে। মরা শকুনটার পাশে পড়ে রয়েছে একটি অর্ধস্ফুট মানুষের শিশু।

‘**সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য**’ (১৯৬৪) গল্পগ্রন্থের অন্যতম গল্প ‘শকুন’। ‘শকুন’ প্রতীকধর্মী গল্প। শকুনের প্রতিকায়নে গল্পকার রাঢ়বঙ্গের তথা মানব সমাজ জীবনের শোষক শ্রেণি সুদখোর মহাজন এবং সমকালীন শাসকগোষ্ঠীর চিত্র তুলে ধরেছেন। গল্পের রূপায়নে ছেলের দলের ভূমিকা আদি-মধ্য ও অন্ত্য জুড়েই পরিশিলিত। ছেলের দলের মধ্যে গরু চরানো রাখাল আছে। স্কুলের ছাত্র আছে। স্কুলের ছাত্র অথচ দরকার হলে গরু চড়ায়, ঘাস কাটে আর বীজ বোনে এমন ছেলেও আছে। সান্ধ্যকালীন আড্ডায় ছেলের দল মশগুল ছিল কিন্তু তারা যখন মৃতপ্রায় শকুনকে দেখল তখন তাদের মনে একটা কৌতূহলের প্রশ্ন জেগে উঠছে। কেউ বলছে মোল্লা শিকুনি আবার অন্য কেউ বলছে মোড়ল শিকুনি-

> “পল্টু বলল, শিকুনি লয়?
> হ্যাঁ, দেখতে পেছিস না?
> মোল্ল শিকুনি নয় তো?
> বোধহয় মোড়ল শিকুনি।”[১]

ছেলের দলের কথোপকথনে আমাদের সমাজ জীবনে আমরা শাসক গোষ্ঠী মোল্লা ও মোড়ল শ্রেণির মানুষদের পরিচয় পেয়ে যায়। যারা সমাজের চালক এবং সমাজের মানুষদেরকে তারা সারাক্ষণ নিজেদের বশীভূত করে রাখার চেষ্টা করেন। সে চেষ্টা তাদের নিজেদের বানানো প্রতাপশালী। ‘শকুন’ গল্পটিকে যেহেতু লেখক প্রতীকায়নের দর্পণে বোধগম্য করে তোলার প্রয়াস রাখেন সেহেতু আমরা মোল্লা-মোড়ল শ্রেণির মানুষদেরকে শকুনের আওতায় আনতে পারি। শুধুমাত্র মোল্লা-মোড়ল নয় সুদখোর মহাজনদেরও আনা হয়েছে। গল্পের প্লট জুড়ে ছেলের দলকে আনা হয়েছে সমাজের অভিব্যক্তির প্রকাশ রূপে। তাইতো ছেলের দল ঐক্যবদ্ধ ভাবে একটার পর একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। তারা শকুনটাকে নিয়ে হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে টানা হ্যাঁচড়া করে মৃত্যু যাত্রার দিকে নিয়ে যেতে চায়। তাদের উক্ত মত্ততার মধ্যদিয়ে গল্পের অবয়ব জুড়ে শোষক শ্রেণির প্রতি সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসা। তারই প্রয়াস তুলে ধরা হয়েছে। ছেলেদের কথায় শকুনটাকে দেখে তাদের রাগ লাগে, মনে হয় তাদের খাদ্য যেন শকুনের খাদ্যে পরিণত হয়েছে। মানুষের খাদ্য কেড়ে নেয় সমাজের শোষক শ্রেণির

প্রতাপশালী ব্যক্তিরা। সাধারণ-শ্রমজীবী পরিশ্রমী মানুষেরা তাদের কাছে ভোগ্যতায় পরিণত হয়। শকুনরা যেমন ভাগাড়ের গন্ধ শুঁকে বেড়ায় তেমনি সমাজের সুদখোর ব্যক্তিরা লোলুপতার দৃষ্টি নিয়ে সাধারণ মানুষদেরকে পোষণ করে তৃপ্তি অর্জন করে গল্পকার হাসান আজিজুল হক শকুনকে প্রতীকের বয়ানে শোষক শ্রেণি সুদখোর মানুষের চিত্রায়ণে বালকদেরকে হাতিয়ার করে সে ভাব ব্যক্ত করেছেন –

> "সুদখোর মহাজনের চেহারার কথা মনে হয় ওকে দেখলেই। নইলে মহাজনকে লোকে শকুন বলে কেন। কেন মনে হয় শকুনটার বদহজম হয়েছে। ...ওরে শালা, পালাইতে চাও, শালা শিকুনি, শালা সুদখোর অঘোর বোষ্টম। অঘোর বোষ্টমের চেহারার কথা মনে পড়তে হা হা করে হেসে উঠল সবাই।"[২]

হাসান আজিজুল হক বাস্তব সমাজ জীবনের রূপকার। তাঁর গল্পে সমাজ জীবনের বহুমাত্রিক রূপায়ণ ও বিপন্ন-জীবন সংকটের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে গবেষক সমালোচক চঞ্চল বোসের উক্তি উল্লেখযোগ্য –

> " 'শকুন' গল্পটি কেবল সুদখোর মহাজন অঘোর বোষ্টমের শোষণ ও সীমাহীন লোলুপতার ইতিবৃত্ত নয়, গল্পের পরিণামী ব্যঞ্জনা ও ইঙ্গিতময়তা 'শকুন' গল্পটিকে বহুমাত্রিকতায় উন্নীত করেছে।"[৩]

আলোচ্য 'শকুন' গল্পে সুদখোর মহাজনের পাশাপাশি তিনি সমকালীন সমাজ জীবনের অবক্ষয়িত রূপের পরিচয়ও তুলে ধরেছেন। আমরা গল্পে দেখতে পাচ্ছি ছেলের দল শকুনের পিছু ধাওয়া করতে করতে মানুষ মারীর মাঠে এসে পড়েছে। গল্পে বর্ণিত –

> "উরে সব্বেনাশ, মাছ মাঠে এসে পড়িচি, মানুষ মারীর মাঠ যে র‍্যা! উইটো নির্চয় কেলেনের পাড়। ...শুনিচিস রাত দোপরে কি সব হয়? ...ঘরের খিল খুলে মেয়ে হোক আর মরদ হোক ঘুমের ঘোরে মাঝ মাঠে চলে আসে।"[৪]

মাঝ-মাঠে মানুষ মারীর মাঠ কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়। ১৯৬৪ সালে সমকালীন সমাজ জীবনের চিত্র পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় দেশভাগ, উদ্বাস্তু, দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য বিপর্যয়ের ফলে উভয় বঙ্গে ব্যাপক বেকারত্বের প্রভাব দেখা যায়। সাধারণ মানুষের জীবনে এক হতাশা-জনক বিপন্ন সংকটের সৃষ্টি হয়। ফলে সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে বিবেক-বোধহীন অন্ধত্বের দিকে ঝুঁকে পড়ে, এটাকে বন্ধ্যাত্ব যুগ বলতে পারি। মানুষ রাতের অন্ধকারে যুবক-যুবতী ও অন্যান্য প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে যৌনলালসার উগ্রতা দেখা যায়। 'শকুন' গল্পের প্রেক্ষাপট রাঢ়বঙ্গ। রাঢ়বঙ্গে এই উগ্রতার ফলে রাত-দুপুরে মাঝ মাঠে মেয়ে-মরদ ঘরের বাইরে এসে অবৈধ প্রনয়ের লিপ্ততায় জড়িয়ে যায়। তার ফল অবৈধ অধঃস্ফুট শিশুর জন্ম এবং সেই শিশুর অকাল মৃত্যু। এই মৃত্যু শঙ্কাকেই কেন্দ্র করে ছেলের দলের ভয়াতুর মনে মানুষ মারীর মাঠের ভয়ানক কাতরতা তাদের মনকে নাড়া দেয়। আমরা নিবন্ধের সূচনায় যে বর্ণনার উল্লেখ করেছিলাম, সে প্রসঙ্গে গল্পের উদ্ধৃতি নিম্নরূপ -

> "তালগাছ ওপাশে ন্যাড়া বেলগাছের যে ছোট তোরণটি আছে তারই আবছা ছায়ায় শাদামত কি দেখা যাচ্ছে। ...বাড়ি কাচে বলেই জানি, ও শালা শালী ক্যা? ...উ হচ্চে জমিরদ্দি আর কাদু শ্যাখের রাঁড় বুন।"[৫]

'শাদামত কি দেখা যাচ্ছে' ও 'জমিরদ্দি আর কাদু শ্যাখের রাঁড় বুন' উভয় বাক্য বন্ধনে আমাদের কাছে পরিষ্কার যে 'একজন পুরুষ' আর একজন 'রাঁড়বুন' - বন্ধ্যাত্ব যুগের চিত্রায়ণ। তাদের এই প্রণয় গল্পের শেষ পর্যায়ে এসে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে সমকালীন সমাজের অবক্ষয়িত রূপ যেটাকে আমরা শোষণ বলতে পারি। এই শোষণ বা অবৈধতার ফল অকাল প্রয়াত বহু শিশুকে ভোগ করতে হয়, যেটাকে আমরা অবক্ষয়িত সমাজ রূপের শিশু হত্যা বলতে পারি। তার প্রমাণ আলোচ্য 'শকুন' গল্প –

> "ন্যাড়া বেলতলা থেকে একটু দূরে প্রায় সকলের চোখের সামনেই গত রাতের শকুনটা মরে পড়ে আছে। মরার আগে সে কিছু গলা মাংস বমি করেছে। ...মরা শকুনটার কোনটার পাশে পড়ে রয়েছে অর্ধস্ফুট একটি মানুষের শিশু। তারই লোভে আসছে শকুনের দল। ...আশেপাশের বাড়িগুলি থেকে মানুষ ডেকে আনছে মৃত শিশুটি।"[৬]

১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দাঙ্গার ফল ১৯৪৬ সালে ভারতবিভাগ। দেশভাগের ফলে মানুষের জীবন ছন্নছাড়ায় পরিণত হয়। উদ্বাস্তু মানুষরা অস্তিত্বের সংকটে পড়ে ভারতবর্ষের মানুষ পূর্ব পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ ভারতে আশ্রয়ের খোঁজে এপ্রান্ত ওপ্রান্ত ছুটে বেড়ায়। উক্ত দেশ হারানো দিক্ ভ্রান্ত রূপটিকে আমরা সমাজ জীবনের মহাসংকট বলতে পারি।

মহাসংকট রূপায়ণের এক অন্যতম কথাকার হলেন হাসান আজিজুল হক। যাঁর একটি অন্যতম আলোড়ণ সৃষ্টিকারী গল্প 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ'। উক্ত গল্পেই গল্পকার উদ্বাস্তু কেন্দ্রিক বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রতিকায়িত করেছেন।

'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পের অন্যতম তিনজন চরিত্র - ইনাম, ফেকু ও সুহাস। তারা যুবক ব্যক্তি। সমাজের বুকে তাদের জীবনে বেকারত্বের বিষাদময়তার ছায়া নেমেছে। তারা তাদের স্বাভাবিক জীবন পড়াশোনার জগৎ থেকে বিছিন্ন হয়ে চুরি-ডাকাতি ইত্যাদির বেআব্রু পথে নেমে পড়েছে। তারা যৌবনে উপনীত প্রবৃত্তির তাড়নায় কখনো মামীর বোনেদের সঙ্গে দেহ মত্ততায় মেতেছে আবার কখনো কখনো এদিক সেদিক করে নিজেদের ইচ্ছে মতো সময় পার করেছে। গল্পের অগ্রসরে দেখা যায় তারা নিজেদের মন শান্ত রাখার জন্য শরীরী ওমের প্রয়োজনে এক জঙ্গলের মধ্যে একটি বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। বাড়িটি এক বৃদ্ধের; অসহায় বৃদ্ধ পরিবার নিয়ে উদ্বাস্তু কালীন সময় থেকে এই জঙ্গলের বাড়িটিতে ঘর বেঁধেছে। অর্থ কষ্টের টানাপোড়েনে বৃদ্ধ বেঁচে থাকার জন্য দু-টাকার বিনিময়ে এবং কিছু পয়সা পাওয়ার আশায় বড় মেয়ে রুকুকে দিয়ে দেহ ব্যবসার কাজে জড়িয়ে যায়। জড়িয়ে পড়ার যন্ত্রণা যে কত মর্মান্তিক বেদনাদায়ক বৃদ্ধ তা একটি করবী গাছ প্রতিপালনের মাধ্যমেই যন্ত্রণা পোষণ করে গেছে। করবী গাছ প্রতিপালন করেছে বৃদ্ধ ফুলের আশায় নয়, করবী গাছে সুন্দর বিষ হয় তার আশায় করবী গাছ প্রতিপালন করেছে।

দেশভাগ, দাঙ্গা ও উদ্বাস্তু ভারতবর্ষের বুকে এক বহুল যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা। এই ঘটনা শিকার সেকাল থেকে একাল তা বহুকাল চলবে হয়তো। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' হাসান আজিজুল হকের প্রতীকধর্মী দেশভাগের উদ্বাস্তু কেন্দ্রিক গল্প। এ প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ ঘোষ - এর উক্তি স্মরণযোগ্য -

> "কেশো-বুড়ো উদ্বাস্তু মানুষ, দেশ-ছাড়া অসহায় এক পিতা। চরিত্রসমূহের ভাষা থেকে বোঝা যায় এদের বাস উত্তরবঙ্গে। পক্ষান্তরে কেশো-বুড়ো শুকনো-দেশ (পশ্চিমবাংলা কি?) থেকে এসেছে সে অঞ্চলে। বোঝা যায় দেশ-বিভাগের পটভূমিতে লেখা এই গল্প। দেশ বিভাগ মানুষকে বাংলার জনসাধারণকে যে ভাবে বিপন্ন উন্মুলিত লাঞ্ছিত করেছে, তারই যেন প্রতিকী রূপ কেশো-বুড়ো।"[৭]

উক্ত গল্পে আমরা যে তিন যুবক চরিত্রের পরিচয় পাচ্ছি তাদের মধ্যে ইনাম বেকার-ছিঁচকে চোর আর সুহাস নাপিত। তারা শীতকালে রাতের অন্ধকারে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য চলেছে। তাদের কথাবার্তায় এক ছন্নছাড়া জীবন সংকটের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পের অন্যতম চরিত্র ফেকু। ফেকুর বগলে ট্রানজিস্টারে গান বাজছিল। সংগীত মানুষের জীবনে আনন্দ প্রেরণা সঞ্চারিত করে। তাইতো ট্রানজিস্টারে ফেকু গান আরম্ভ করেছে –

> "কনিকা বিলের কিনারায় দারুণ ঠান্ডায় বৃথাই গাইছিলেন অন্ধকারে একা থাকার যন্ত্রণা।"[৮]

কিন্তু সেই গান ওরা শুনছিল না ওরা বলতে ফেকু আর সুহাস। এমনি গান বেজে চলছিল। এমনি গান বেজে চলার মধ্য দিয়ে আমরা বলতে পারি তাদের জীবনের হতাশা তারা দূর করতে চায়। কিন্তু সে গান ইনামের শুনতে অসহ্য লাগে। সে চিত্র গল্পকারের ভাষায় নিম্নরূপ -

> "রেডিওডা বন্ধ করে দে - ওদের দেখে ইনাম বলল। অসহ্য লাগছিল তার। ...ইনামের আবার অসহ্য লাগল ।রেডিওডা বন্ধ করে দে - বলল সে।"[৯]

ইনামের অসহ্যতার ফলে কণিকার গলা টিপে দিল। অর্থাৎ রেডিওটা বন্ধ করে দিল। ১৯৪৭ সালে তৎকালীন সময়ের দেশভাগের চিত্র গল্পে বর্ণিত হয়েছে। দেশভাগের ফলে তারা যে রাঢ়বঙ্গ ছেড়ে পূর্ববঙ্গে এসেছে তা ইনামের স্মৃতিচারণে সে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়-

> "নাকে ধুলো এসে লাগতেই রুখু গন্ধ পাওয়া যায়। ইনামের বিকেলের কথা মনে পড়ে, হাট বারের কথা, মাছের কথা। মাছ থেকে নদী। নদী এখন প্রায় শুকনো, চড়া পড়ে গেছে। গরুর গাড়িতে লোকে বালি আনছে নদী থেকে। বাঁকের কাছে কাশ হয়েছে। এ পাড়ে স্কুলবাড়ি, বড় সজনে গাছে ফিঙে, তার লম্বা লেজের দুলুনি। স্কুলের পেটা ঘড়ি ভেঙ্গে গেলে এক টুকরো রেল ঝুলিয়ে লোহার ডান্ডায় ঘনাৎ ঘনাৎ আওয়াজ - হুড়মুড় করে হেডমাস্টার... শালার জোকার একডা, বই বগলে মাস্টার তারাপদ, তার পাকানো চাদর, আধভাঙ্গা দাঁত আর মুখে কথার ফেনা এইসব মনে পড়ল। ঝরঝর করে ছবিগুলো এলো যেন দক্ষিণ বাতাসে নিমের হলুদ শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে আর ছবিগুলো চলে গেল যেন ট্রেনটা যাচ্ছে পুল পেরিয়ে।"[১০]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - ii, April 2024, tirj/April 24/article - 10
Website: https://tirj.org.in, Page No. 70 - 76
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দেশভাগের ফলে সমাজ জীবনে অবক্ষয়ের বিপর্যয় নেমে আসে। বিপর্যয়ের ফলে বেকারত্বের হার বেড়ে যায়। উক্ত বেকারত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আলোচ্য গল্পের তিন যুবক চরিত্র তাদের কথোপকথনে এলোমেলো ছেঁড়া ছেঁড়া ভাব; তাদের ভাব বিনিময়ে কথা বলার সারমর্ম নেই। সুহাস কখনো মামীর বিয়ের বরযাত্রী যাওয়ার গল্প বলছে অনেকক্ষণ সময় নিয়ে বলছে। বরযাত্রী গিয়ে মামীর বোনেরা যা সুন্দর সে সুন্দর মেয়েদের সাথে মত্ততার প্রসঙ্গও আসছে। ফেকু চোর। চুরি করে যে বেশি ধরা পড়ছে। মার খাচ্ছে –

> "শালা আজকাল এত বেশি ধরা পড়তিছি কেন কতি পারিস? ...অত মার খাস কি করে? আমাকে বলতে পারিস?"[১১]

- প্রভৃতি কথা-বার্তা তাদের মুখে ফুটছে। ইনামের কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে তার পড়াশোনার ঝোঁক ছিল, বিপর্যয়ের ফলে সেদিক থেকে সরে এসেছে। লেখাপড়া পড়াশুনা করে মানুষ যে বিদ্বান হয় সেই বিদ্বানের ফলে মানুষ ও সমাজের যে অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হয়, সে পথ তাদের কাছে বিষাদময়তার ছায়া নিয়ে এসেছে। তারা আজ বেপথে, তাদের জীবন ছন্নছাড়ায় পরিণত হয়েছে। সুতরাং সুহাস ও ইনামের কথোপকথনে পড়াশোনার বিষয়টি উদ্বাস্তুর ফলে কতটা নেতিবাচক চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ-

> "ইস্কুলি যাতিছিস না আজকাল? সুহাস জিজ্ঞেস করে। না - ইনাম জবাব দেয়। পড়বি না আর? না, পড়লি আমারে কেউ সিন্নি দিবে ক! চাকরি করবি। হয়, চাকরি গাছে ফলতিছে!"[১২]

'চাকরি গাছে ফলতিছে' - এই সংলাপে গল্পকারের মনোভাব তৎকালীন সময়ের পুরো অবক্ষয় সমাজে জীবনের চিত্র রূপায়িত হয়ে যায়।

বাসযোগ্য পৃথিবীতে নিরাশ্রয় মানুষ অসহায়। পৃথিবীর মানুষকে যখন তার দীর্ঘস্থায়ী অবাসস্থল থেকে বিতাড়ন করা হয় ও দেশান্তরিত করা হয়, তখন মানুষের মনে যন্ত্রণার ছায়া প্রতিনিয়ত মানুষকে কুরে কুরে খায়। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' সে রকম যন্ত্রণারই প্রতিকায়ন। গল্পকার হাসান আজিজুল হকের এই অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার যবগ্রামের বাসিন্দা। ১৯৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশভাগের চিত্র প্রতিনিয়ত দেখেছেন। দেশভাগের ফলে বাংলা ভাগ।

ভারতবর্ষের মানুষকে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসতে হয় অপরদিকে পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে ভিটেমাটি ছেড়ে ভারতবর্ষে আসতে হয়। হাসান আজিজুল হকের পরিবারকেও এ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে; পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসতে হয়েছে। এই স্থানান্তরিত উদ্বাস্তুর যন্ত্রণা একজন বৃদ্ধ চরিত্র ও তার পরিবারের মাধ্যমে গল্পকার বর্ণনা করেছেন। বৃদ্ধ চরিত্র অর্থাৎ কেশো-বুড়োর লাগাতার যন্ত্রণার ছাপ দুঃখ-কষ্ট অভাব অনটনের ফলে আত্মজাকে দিয়ে ভিন্ন পথের কাজে নেমেছে। শীতের রাত্রি প্রচন্ড ঠান্ডায় তিন যুবক চরিত্র রাত্রিবেলা যখন তার বাড়ি আসলো তখন বৃদ্ধের অসহায়তার ছাপ চোখে-মুখে বর্তমান। মানসিক যন্ত্রণায় তার অবক্ষয়িত রূপ গল্পের পরতে পরতে ফুটে ওঠে। 'দেশ' ছাড়ার ফলে তার ভেতর বাহির এক হয়ে গেছে, কি ঠান্ডা-গরম সবকিছু একাকার। বৃদ্ধের মনের অসহায় মর্মাহত যন্ত্রণা চিত্রায়ণ গল্পকারের ভাষ্যে এক পরিপূর্ণ অবক্ষয়িত সমাজের চিত্র অবলোকিত হয়-

> "হরাম করে দরজা খোলে, হাতে হারিকেন নিয়ে খোলা জায়গা পেরিয়ে গেটের কাছে আসে মানুষটা। সমস্ত উঠোনটায় বিরাট ছায়া, খাটো লুঙ্গির নিচে শুকনো দুটো পা। গেটের পাশে করবী গাছটার কাছে এসে দাঁড়ায়। আলোটা মুখের কাছে তুলে ধরে লোকটা। বৈশাখ মাসের তাপে মাটিতে যেন ফাটলের আঁকিবুকি এমনি ওর মুখ। ঠান্ডা চোখে ইনামকে দেখে, সুহাসকে দেখে, ফেকুকে দেখে, দেখতেই থাকে, বিঁধতেই থাকে, হারিকেনের বাতিটা তোলে কাঁপা হাতে, এসো। তোমরা? ভাবলাম কে আসছে এত রাতে। তা কে আর আসছে এখানে মরতে? জেগেই তো ছিলাম। ঘুম হয় না মোটেই- ইচ্ছে করলেই কি আর ঘুমানো যায় - তার একটা বয়েস আছে- অজস্র কথা বলতে থাকে সে, মানে হয় না, বাজে কথা বকবক করেই যায়। এসো, বড্ড ঠান্ডা হে, ভেতরে এসো। কিন্তু ভেতরে কি ঠান্ডা নেই? একই রকম, একই রকম। দেশ ছেড়েছে যে তার ভেতর বাইরে নেই। সব এক হয়ে গেছে।"[১৩]

জীবনে বেঁচে থাকার আশায় বৃদ্ধ আত্মজাকে দিয়ে ভিন্ন পথে নেমেছে। এ পথে গিয়ে তিনি আত্মতৃপ্ত অর্জন করতে পারেনি সেটা পথ নয়, বেঁচে থাকার এক পন্থা বলা যায়। কয়েকটা ন্যূনতম টাকার বিনিময়ে তার আত্মজাকে কতগুলি বখাটে ছেলের হাতে তুলে দিয়ে বৃদ্ধ প্রতিনিয়ত করবী গাছ প্রতিপালনে যন্ত্রণা উপভোগ করেছে।

গল্পকার করবী গাছকে আত্মজার প্রতিকায়নে রূপায়ণ করেছেন। সে প্রসঙ্গ গল্পের অন্তিম পর্যায়ে এসে পরিষ্কার হয়ে যায়। বৃদ্ধ তার বড় মেয়ে রুকুকে ফেকু ও সুহাসের হাতে তুলে দিয়ে ঘরে বন্দী রেখে ইনামের সঙ্গে তার সমস্ত যন্ত্রণার ভাগাভাগি করে নিতে চায়-

> "আমি যখন এখানে এলাম আমি যখন এখানে এলাম হাপাতে হাপাতে কাঁপতে কাঁপতে সে বলছে ... সারারাত ধরে সে বলছে, এখানে যখন এলাম আমি প্রথম একটি করবী গাছ লাগাই ... তখন হুহু করে কেঁদে উঠল, চুড়ির শব্দ এলোমেলো শাড়ির শব্দ আর ইনামের অনুভবে ফুটে উঠল নিটোল সোনা রঙের দেহ ... ফুলের জন্যে নয়, বুড়ো বলল, বিচির জন্যে, বুঝেছ, করবী ফুলের বিচির জন্যে। চমৎকার বিষ হয় করবী ফুলের বিচিতে।"[১৪]

'সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য' (১৯৬৪) গল্পগ্রন্থের একটি অন্যতম গল্প হল - 'উত্তরবসন্তে'। 'উত্তরবসন্তে' গল্পের প্রেক্ষাপট দেশভাগ, উদ্বাস্তু। দেশভাগের ফলে রাঢ়বঙ্গ থেকে পাকিস্তানে একটি পরিবারের আশ্রয়। গল্পের অন্যতম চরিত্র লিপি। লিপি চরিত্রকে কেন্দ্র করে কাহিনীর সূত্রপাত। লিপি বি.এ পড়ার সময় পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়বঙ্গে কবীরের প্রেমে সাড়া দিয়েছিল। তাদের প্রেম ভালোবাসার সাক্ষী ছিল লিপির ছোট বোন বাণী। লিপি বাণীকে সাথে করে কবীরের সাথে দেখা করত। দেশভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে লিপির বাবা-মা পরিবার নিয়ে অসহায় অবস্থায় পাকিস্তানে চলে আসে। সেই থেকে কবিরের সাথে একটা বিরহ বিচ্ছেদ হয় এবং অবসাদগ্রস্ততায় লিপি মারা যায়। লিপির উক্ত সমস্ত কাহিনী আমরা লিপির ছোট বোন বাণী চরিত্রের মাধ্যমে জানতে পারি। বাণী বি. এ পড়া আরম্ভ করেছে। নিত্যদিন তাদের অসহায়তা, বাড়িতে বাবা-মা মেয়ে হারানোর শোক গ্রস্ততার চিত্র বাণী সমস্তটা চোখের সামনে দেখে দর্শক হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে জীবনের পথে–

> "সেবার গ্রামের বাড়িতে গিয়ে আর ফিরে আসা হল না সব বন্ধ করে দিতে হলো ঢাকা থেকে বড় ভাই সমস্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন আর তার নিপুন ব্যবস্থায় আমরা বিনিময় করে পাকিস্তানে আসতে পারলাম মাস তিনেকের মধ্যে। কবীরের খবর জানিনা। ... আমরা রিফ্যুজি উদ্বাস্তু।"[১৫]

বাণী বর্তমানে পড়াশোনা করছে চাকরির আশায়। সে অতীতের দিকে তাকিয়ে নিজের পরিবার জীবনের কথা মাথায় রেখে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে –

> "বাপ-মায়ের কাছে মনে হয় জীবনটা জীর্ণ ন্যাকড়ার মত বাতাসে উড়ছে ওদিকের ঐ বন্ধ ছোট ঘরটায় লিপি যে থার্ড ইয়ারে পড়তে একদিন তার সমস্ত ভালোবাসা নিয়ে মরে যাবে তা আমি জানতাম না। আর আজ লিপি যে গিয়েছে সে প্রায় যখন ভুলতে বসেছি, এতদিন পরে, ভালো করে বাঁচবার আকুল চেষ্টায় এই পঁচিশ বছর বয়সে যখন লেখাপড়ার আরেকটা উদ্যম চলছে, যখন ভালোবাসা কথাটা উচ্চারণ করলে আমার বুকটা ধক্ করে ওঠে তখন ইতিহাসের নতুন অধ্যাপক কবীর সাহেব আমাকে সেই লাল রোদের কথা আবার মনে করিয়ে দিল।"[১৬]

কবীরকে দেখে বাণীর রাঢ়ঙ্গের কথা মনে পড়ে আর দিদির কথা মনে পড়ে। গল্পের অগ্রসরে কবীর বাণীর কাছে লিপির সন্ধান জানতে চায়, অবশেষে কবীর বাণীদের বাড়ি এসে তাঁদের মরণ দশার চিত্র দেখতে পেল আর লিপির বদ্ধঘর খোলা মাত্রই কবীরের চোখের সামনে ভেসে উঠল-

> "লিপির হাস্যস্ফুরিত বড় ছবিটা হাওয়ায় দুলছে।"[১৭]

'উত্তরবসন্তে' উদ্বাস্তু কেন্দ্রিক গল্প। উক্ত গল্পে একটি পরিবার ছিন্ন হয়ে যাওয়ার চিত্র অবলোকিত হয়। উদ্বাস্তুর ফলে প্রেম বিচ্ছেদ, সেই বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় লিপির মৃত্যু একটি পরিবারকে অবসাদগ্রস্ততায় নিয়ে যায়। লিপির বাবা-মায়ের জীবনটা জীর্ণ ন্যাকড়ার মতো বাতাসে উড়তে থাকে। উড়তে থাকা জীবনে হতাশার অন্ধকার নেমে আসায় একটি পরিবারের সবটা শেষ হয়ে যায়। সর্বস্বান্ত হয়ে যাওয়া চিত্র হাসান আজিজুল হক তাঁর 'উত্তরবসন্তে' গল্পে মর্মস্পর্শী ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক হলেন জীবন রূপায়ণের অন্যতম কারিগর। তাঁর রচিত গল্পে দেশভাগ, উদ্বাস্তু, দাঙ্গা ও সমকালীন সমাজের চিত্র বহুমাত্রিক বর্ণনারই পরিস্ফুটন। তিনি মূলত বাস্তব অভিজ্ঞতার সঞ্চারন ঘটাতে চেয়েছেন, প্রত্যক্ষ দেখার অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়ে তিনি জীবন-প্রবাহের চিত্রায়নে মানুষের বিপন্ন-জীবন সংকটের চিত্রকে সাহিত্যের আওতায়

আনার চেষ্টা করেছেন। সমাজের মানুষদের ইতিবাচক বার্তা প্রেরণই তাঁর মূল উদ্দেশ্য। সর্বোপরি বলা যায়, আমাদের আলোচ্য তিনটি গল্পই বাস্তব জীবন থেকে উঠে আসা বিপন্ন-জীবন সংকটের রূপায়ণ।

Reference:

১. হক, হাসান আজিজুল, ‘গল্পসমগ্র ১’, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলা বাজার, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ এপ্রিল, ২০১৮, পৃ. ১২
২. তদেব, পৃ. ১৫
৩. বোস, চঞ্চল কুমার, ‘বাংলাদেশের ছোটগল্পের শিল্পরূপ’, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৪১৫/এপ্রিল ২০০৯, পৃ. ১৮২
৪. হক, হাসান আজিজুল, ‘গল্পসমগ্র ১’, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলা বাজার, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ এপ্রিল, ২০১৮, পৃ. ১৬
৫. তদেব, পৃ. ১৭
৬. তদেব, পৃ. ১৮
৭. ঘোষ, বিশ্বজিৎ, ‘ছোটগল্পের শিল্পরূপ: হাসানের ‘আত্মজা...’, ‘গল্পকথা’, মাঘ ১৪১৮, ফেব্রুয়ারি ২০১২, বর্ষ ২, সংখ্যা ৩, পৃ. ৭১
৮. হক, হাসান আজিজুল, ‘গল্পসমগ্র ১’, মাওলা ব্রাদার্স, ৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ এপ্রিল, ২০১৮, পৃ. ১১০
৯. তদেব, পৃ. ১১০
১০. তদেব, পৃ. ১১০
১১. তদেব, পৃ. ১১
১২. তদেব, পৃ. ১১০
১৩. তদেব, পৃ. ১১৩
১৪. তদেব, পৃ. ১১৫
১৫. তদেব, পৃ. ৭৪
১৬. তদেব, পৃ. ৭৪
১৭. তদেব, পৃ. ৭৫